بسم اللہ الرحمن الرحیم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ মে, ২০১৯ মোতাবেক ১০ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৪-১৮৭)

এই আয়াতগুলোর অর্থ হলো- হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপরও রোযা রাখা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমারা তাকওয়া অবলম্বন কর, আর আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক। অতএব তোমরা রোযা রাখ হাতে গোণা কয়েক দিন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তার অন্যান্য দিনে রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর অর্থাৎ রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য সামর্থ্য থাকলে ফিদিয়াস্বরূপ একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কোন পুণ্যকর্ম করে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম। রমজান মাস হলো সেই মাস যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই কুরআন যা সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েতরূপে প্রেরিত হয়েছে, অথবা যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা স্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণাদিতে সমৃদ্ধ, এমন যুক্তি-প্রমাণ যা সঠিক পথের দিশা দেয়। আর একইসাথে পবিত্র কুরআনে ঐশী নিদর্শনও রয়েছে। তাই তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই মাসকে এই অবস্থায় পায় যে, সে অসুস্থও নয় আর মুসাফিরও নয়, তার উচিত সে যেন এতে রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে এই গণনা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজসাধ্যতা চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর এই আদেশ তিনি এ জন্য দিয়েছেন যেন তোমরা কষ্টের সম্মুখীন না হও এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর, আর এজন্য আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর কেননা তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, এবং যেন তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর হে রসূল! আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন বল, আমি তাদের নিকটেই রয়েছি। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার প্রার্থনা

গ্রহণ করি। সুতরাং সেই প্রার্থনাকারীদেরও উচিত তারা যেন আমার আদেশ মান্য করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, যেন তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা রোযার আবশ্যকতা, এর গুরুত্ব, এই মাসে মু'মিনদের দায়িত্বাবলী এবং দোয়া কিভাবে গৃহীত হতে পারে-তা বর্ণনা করেছেন। তিনি এমন একটি মাস আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন যাতে খোদা তা'লা বান্দার সবচেয়ে কাছে এসে যান আর শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করেন। অতএব যেখানে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য এত বেশি কৃপা ও অনুগ্রহের দ্বার খোলা হচ্ছে সেখানে আমাদের কত সচেতনতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মান্য করে যথাযথভাবে রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিত! মহানবী (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, তোমাদের যদি জানা থাকে যে, রমজানে কী কী কল্যাণরাজি অন্তর্নিহিত আছে আর আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে এবং কতটা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হন তাহলে তোমরা এই বাসনা করতে যেন সারা বছরই রমজান হয়। পুরো বছর জুড়েই যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভ করতে থাকি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরই উপকারার্থে আমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করেছেন। আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক সকল প্রকার কল্যাণ আমরা রোযার মাধ্যমে লাভ করতে পারি। এখন তো অমুসলিম ডাক্তাররাও এ কথার স্বীকার করছে, পূর্বে তাদের সংখ্যা দু'একজন ছিল, এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, যে, রোযার মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর সুখকর প্রভাব পড়ে। বরং কতিপয় অমুসলিম এখন এ কথা লিখতে আরম্ভ করেছে যে, রোযার মাধ্যমে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয়। যাহোক এই জগৎপূজারীরা বলুক বা না বলুক, এক প্রকৃত মু'মিনের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, রোযা যেখানে এক মু'মিনের দৈহিক অবস্থাকে উন্নত করে সেখানে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি আধ্যাত্মিকভাবেও তার অবস্থায় উন্নতি সাধনের কারণ হয়। অতএব আমাদের আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশের ওপর আমল করে রমজান মাসে নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন সেগুলো হলো, প্রত্যেক মু'মিন এবং প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে কাটানোর নাম রোযা নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর (অর্থাৎ রোযার) মাধ্যমে খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো এক খাবার কমিয়ে অপর খাবার বৃদ্ধি কর। রোযাদারের সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, এর (অর্থাৎ রোযার) অর্থ শুধু এটিই নয় যে, অনাহারে থাকবে, বরং তার খোদা তা'লার স্মরণে মগ্ন থাকা উচিত যেন তাবাত্তুল ও ইনকিতা অর্জন হয়, অর্থাৎ খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর ইবাদত ও স্মরণের ক্ষেত্রে মানুষ যেন উন্নতি করে আর জগতের প্রতি আকর্ষণ যেন হ্রাস পায়। জাগতিক কাজকর্ম তো লেগেই থাকে, সেগুলো থেমে যায় না, কিন্তু তা করার সময়ও যেন খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখা হয়, তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাঁর স্মরণ যেন অব্যাহত থাকে। তিনি বলেন, অতএব রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের এক খাবার যা দেহের লালন করে তা পরিত্যাগ করে অপর খাবার হস্তগত করা যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। যারা কেবল প্রথাগতভাবে নয় বরং শুধুমাত্র খোদার খাতিরে রোযা রাখে তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন এবং একত্ববাদের ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকা।

মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, তোমাদেরকে অনাহারে রাখার আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে-এই কথা বলার পর তিলাওয়াতকৃত প্রথম

আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা এজন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তাকওয়া কী জিনিস? তাকওয়া হলো, তোমরা যেন আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে অনাহারে রাখার আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ রোযা তোমাদের মাঝে তাকওয়ার সেই মান সৃষ্টি না করবে, যার মাধ্যমে তোমরা সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে পার, রোযা রাখা অর্থহীন। আর তাকওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে লিখেন-

মুত্তাকী হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো বড় বড় পাপ যেমন- ব্যভিচার, চুরি, অধিকার হরণ, লোকদেখানো, কৃত্রিমতা, আত্মশ্লাঘা, মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, কৃপণতা ইত্যাদি পরিত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত হওয়া, অর্থাৎ এই যে মন্দ বিষয় সমূহ রয়েছে এগুলো পরিত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত হওয়া, আর নোংরা বা হীন অভ্যাস পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে মহান নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে উন্নতি করা, অর্থাৎ প্রশংসনীয় স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হওয়া। মানুষের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করা, তাদের প্রতি দয়া, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা। খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা। এটিও তাকওয়ার জন্য এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য আবশ্যকীয় যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততা থাকে এবং সত্যিকার সম্পর্ক থাকে। সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় মর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের বিষয়টিও এর অন্তর্গত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নির্দেশ পালন করা, একইসাথে মানুষের সাথে সম্পর্ক এবং তাদের সেবার বিষয়টিও এর অধীনে আসে। অর্থাৎ সেবা যেন এমন নিঃস্বার্থ হয় যা দেখে মানুষ বলবে যে, আসলেই খোদা তা'লার খাতিরে সেবা করছে। কোন প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ যেন না থাকে। তিনি বলেন, এসব বিষয়ের মাধ্যমেই মানুষ মুত্তাকী হিসেবে অভিহিত হয়। আর যাদের মাঝে এসব গুণাবলী পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ যারা এসব বৈশিষ্ট্যকে সমবেত করে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কারো মাঝে যদি বিচ্ছিন্নভাবে এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না, যতক্ষণ উন্নত নৈতিক গুণাবলী সামগ্রিকভাবে তার মাঝে সৃষ্টি না হবে। আর এমন ব্যক্তিদের জন্যই বলা হয়েছে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (সূরা ইউনূস: ৬৩)। অর্থাৎ তাদের কোন ভয়ও থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার এই নিশ্চয়তা লাভের পর তাদের আর কী চাই। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান, যেমনটি তিনি বলেছেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (সূরা আল্ আরাফ: ১৯৭)।

হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তাদের হাত হয়ে যান যার দ্বারা তারা ধরে। তাদের চোখ হয়ে যান যার দ্বারা তারা দেখে। তাদের কান হয়ে যান যার দ্বারা তারা শোনে। তাদের পা হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা চলে। অপর এক হাদীসে আছে- যে আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমি তাকে বলছি যে, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এক জায়গায় তিনি বলেন, যখন কেউ খোদার ওলী বা বন্ধুর ওপর হামলা করে তখন খোদা তা'লা তার ওপর সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যেভাবে এক সিংহীর কাছ থেকে তার শাবক ছিনিয়ে নিলে সে ক্রোধের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতএব রোযার শর্ত অনুসারে রোযা রেখে কেউ যদি তাকওয়ার এই মানে উপনীত হয় কেবল তবেই রোযা মানুষকে, এক মুসলমানকে এবং এক মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'লার ঢালের নিরাপত্তায় নিয়ে আসে।

হযরত আবু হুরায়রার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা ব্যতিরেকে মানুষের প্রতিটি কর্ম তার নিজের জন্য হয়ে থাকে। অতএব রোযা আমার উদ্দেশ্যে রাখা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে। যারা প্রকৃত মু'মিন তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে। আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেছেন, যে আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রখে আমি এর প্রতিদান হয়ে যাই বা আমি তাকে নিজের পক্ষ থেকে যা ইচ্ছা প্রতিদান দেব। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর রোযা হলো বর্ম। তোমাদের কেউ যদি রোযা রাখে তাহলে সে যেন কামোদ্দীপক কথাবার্তা এবং গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কোন প্রকার কামোদ্দীপক কথাবার্তা যেন না হয় এবং গালমন্দ যেন না করে। কেউ তাকে গালি দিলে বা তার সাথে কেউ ঝগড়া করলে তার প্রত্যুত্তরে বলা উচিত যে, আমি রোযা রেখেছি। আমি কোন প্রকার বাজে বিষয়ে জড়াব না। এটি বর্ণনা করার পর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম, যার নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাণ রয়েছে, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কস্তুরির চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। অর্থাৎ কস্তুরির সৌরভ থেকে উত্তম। তিনি বলেন, রোযাদার ব্যক্তির জন্য দুটো আনন্দ নির্ধারিত রয়েছে যা তাকে আনন্দ দিয়ে থাকে। একটি হলো সে যখন রোযা খোলে তখন আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য ইফতারির ব্যবস্থা করেছেন। আর দ্বিতীয়ত সে যখন স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন রোযার কারণে আনন্দিত হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমিই এর প্রতিদান বা আমি তাকে প্রতিদান দেব। আর আল্লাহ্ রোযাদারকে যে অনন্ত প্রতিদান দেবেন সেখানে তার আনন্দের চিত্রই ভিন্ন হবে।

অতএব এটি হলো তাকওয়ার সেই মান যা একজন প্রকৃত মু'মিনের অর্জন করা উচিত। আর প্রকৃত রোযাদার তা অর্জন করে থাকে। অর্থাৎ রোযা সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত থেকে রাখা উচিত। আর সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থেকে রোযাদার ব্যক্তির দিন কাটানো উচিত। আমি রোযা রেখেছি-এই কথা ভেবে যেন আনন্দিত না হয়ে যায়। পৃথিবীতে অনেক রোযাদার রয়েছে যারা বাহ্যত রোযা রাখে। কিন্তু তাদের নামাযেরও সেই মান নেই যা হওয়া উচিত আর তাদের চারিত্রিক মানও তেমন নয় যেমন হওয়া উচিত। মহানবী (সা.) যে বলেছেন, এই মাসে শয়তান শিকলাবদ্ধ হয়ে যায়, তাকে বেঁধে দেয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, রমজান মাসেও পৃথিবীতে পাপ কেন হয়? রোযা তাদের জন্য ঢালের কাজ দেয়, শয়তানের হামলা থেকে তাদের রক্ষা করা হয় যারা রোযার প্রকৃত মর্ম বুঝে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং এটি রোযার সেই উদ্দেশ্য যা আমদের সব সময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। নতুবা মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রমজানে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয় জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদের শিকলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ কথা বলে সতর্কও করেছেন আর এ কথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কেউ যদি রমযজান পায় আর ক্ষমা লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে আর কবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং একথা তিনি আমাদের বলছেন, যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয় তাদের বলছেন, আর তাদের বলছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, রোজা তোমাদের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে যেন তোমরা এই দিনগুলোতো খোদার ইবাদতের উন্নত মান ও উন্নত নৈতিক মান অর্জনের চেষ্টা কর। কিন্তু যদি তা না কর তাহলে রমজানের আগমন, শয়তান শিকলাবদ্ধ হওয়া, জান্নাতের দ্বার খোলা, জান্নামের দরজায় তালা লাগা কোন কাজে দেবেনা। তিনি সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ তা'লা-

র এত ব্যপক রহমত সত্ত্বেও যদি ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে আর কখন তা হবে? সুতরাং আমরা আনন্দিত হয়ে রমজান আসার কারনে কেবল শুভেচ্ছা যেন বিনিময় না করি বরং আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আল্লাহ্ রমজানের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা অর্জনের চেষ্টা আমরা করছি কি-না। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তা অর্জনের তৌফীক দিন আর স্বীয় ক্ষমা ও মাগফিরাতের চাদরে আবৃত রাখুন।

পুনরায় তোমরা কোন্ পরিস্থিতিতে রোযা ছাড়তে পার, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা বলার পূর্বে খোদা তা'লা এটি স্পষ্ট করেছেন যে, আমি রোজার প্রতিদান হয়ে যাই আর মু'মিনদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমা করার ব্যবস্থা করি। তাই এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা রোজা রেখে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করছি যার কারণে আল্লাহ তা'লার দয়া, স্নেহ ও ক্ষমার চাদর আমাদের ওপর বিস্তৃত করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদার দয়া ও স্নেহ বিস্তৃত করা হয়েছে। কিন্তু এটি তেমন কোন বড় কুরবানী নয়। সেহরীর সময়ও আমরা পেট ভরে খেয়ে নেই আর ইফতারীর সময়ও প্রত্যেকেই পছন্দ অনুযায়ী খেয়ে নেয়। এটি স্থায়ী কোন কুরবানী নয়। বছরে হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। কেউ কেউ রোযা রেখে বড় গর্বের সাথে বলে যে, আমরা রোযা রেখেছি। স্মরণ রাখবেন, এটি বড় কোন কুরবানী নয় যা প্রকাশ করতেই ইবে। বরং সত্যিকার মু'মিন বড় থেকে বড় কুরবানী করেও ভয় পায় যে, খোদা কখন ও কীভাবে সন্তুষ্ট হবেন। প্রকাশ করাতো দূরের কথা, অল্লাহ তা'লা বলেছেন হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। বছরের বারো ভাগের একভাগ। তাই এটি বড় কোন কুরবানী নয়। পুনরায় বলেন, এতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্বীয় করুণায় ভূষিত করছেন। এ দিনগুলোতেও অর্থাৎ হাতে গোণা এ কয়েকটি দিনে তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় বা সফর আসে তাহলে এ দিনগুলোতে রোজা রাখার বিষয়ে ছাড় রয়েছে। কিন্তু ছুটে যাওয়া রোযার এই সংখ্যা বছরের যে কোন সময় পূর্ণ করতে হবে। কোন অজুহাত নয়, বরং যারা চিররোগী অর্থাৎ যদি ডাক্তার বলে থাকে যে, রোযা রাখবেনা, তাহলে যদি সামর্থ্য থাকে একজন মিসকীনকে রোযা রাখাও। সামর্থ্য থাকলে এটি করা আবশ্যক। অবশ্য কেউ যদি আর্থিক দিক থেকে এতটা অসচ্ছল হয়ে থাকে যে, তার নিজেরই জীবন অতিবাহিত হয় সদকা এবং অন্যের সাহায্যের মাধ্যমে, তাহলে ভিন্ন কথা। বাকি সবার জন্য নিজে যা খায় অনুরূপ খোরাক সরবরাহ করে একজন মিসকীনকে রোযা রাখানো আবশ্যক। হ্যাঁ যদি এর বেশি সামর্থ্য থাকে তাহলে ফিদিয়াও দিয়ে দাও, আর একইসাথে রোযাও রাখ। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত ভার দেন না। তিনি বলেন, সাধ্য অনুসারে যতটা সামর্থ্য আছে, নিজে যা পানাহার কর সে অনুযায়ী অতীতের জন্য ফিদিয়া দিয়ে দাও আর ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার কর যে, অবশ্যই সব রোযা রাখব। একবার আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কী? তখন ভাবলাম অর্থাৎ আমার সামনে স্পষ্ট হলো যে, এটি সামর্থ্য লাভের জন্য। অর্থাৎ ফিদিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে যেন আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার সামর্থ্য দান করেন, যেন সে রোযা রাখার সামর্থ্য পায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মারোগীকেও রোযা রাখার শক্তি দান করতে পারেন। অর্থাৎ তাকেও সুস্থ করে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার শক্তি দিতে পারেন। তিনি বলেন, ফিদিয়ার উদ্দেশ্য হলো সেই শক্তি অর্জিত হওয়া আর এটি খোদার কৃপাতেই হয়। তিনি বলেন, আমার মতে খুব ভালো হয় যদি মানুষ দোয়া করে যে, হে আমার প্রভু! এটি তোমার একটি আশিসময় মাস আর আমি

এটি থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কিনা, আর এই ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রাখতে পারব কিনা। অর্থাৎ স্বাস্থ্য অনুমতি দিবে কিনা (তা জানি না)। তিনি বলেন, এই কথাগুলো নিবেদন করে আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের সামর্থ্য যাচনা করা উচিত।

অতএব সাময়িকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিও ফিদিয়া দিতে পারে। আর সফরের সমাপ্তিতে রোযা রাখাও তার জন্য আবশ্যক। এই উভয় বিষয় এটি থেকে প্রমাণিত হয়। যারা সুস্থতা লাভের পর রোযা রাখতে সক্ষম তাদের জন্য শুধু ফিদিয়া দেয়াকে যথেষ্ট মনে করা অবৈধকে বৈধকরণের দ্বার উন্মোচনের নামান্তর। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভালো নয় কিন্তু রমজানের পর সুস্থতা ফিরে পায় এমন ব্যক্তি যদি বলে বসে যে, আমরা রমজানের ফিদিয়া দিয়েছি-এটি অবৈধ বৈধকরন বৈকি? এটি কেবল অযৌক্তিক ছাড় বা অনুমতির পথ খুলে দেয়া এবং বিদাতের সূচনা করা। ফিদিয়া আদায় করে দিলেও রমজানের পর রোযা রাখা আবশ্যক। অবশ্য চিররোগী, দুগ্ধবতী মা, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের এই অবস্থায় যদি বছর কেটে যায় তাহলে তাদের জন্য ফিদিয়াই যথেষ্ট। কিন্তু ফিদিয়ার পাশাপাশি এই মাসে ইবাদত, যিকরে ইলাহী এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখা আবশ্যক। এমন নয় যে, আমরা ফিদিয়া দিয়ে সকল দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম। অতএব রোযা না রাখলেও তারা রমজানের কল্যাণ লাভ করবে যদি ফিদিয়া দেয় এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখে। ফিদিয়া দিয়ে নামায ভুলে যাওয়া এবং অন্যান্য নেক কর্ম ভুলে যাওয়া মু'মিন বা প্রকৃত মু'মিন বানায় না এবং রমজানের কল্যাণরাজির অংশীদার করে না। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেন যে, তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে যে পুণ্যকর্মই কর, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নির্দেশ মনে করে যদি কর, আল্লাহ্ তা'লা এর ভালো ফলাফল সৃষ্টি করবেন। কারো কারো মতে مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا এর অর্থ হলো কোন কাজ নফল ইবাদত মনে করেও যদি কর, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এই আয়াতের উভয় অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ ঐচ্ছিকভাবে অতিরিক্ত ফিদিয়া প্রদান করে বা একের পরিবর্তে দুজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায় বা আজকে কোন কারণে রোযা রাখতে পারি নি আগামীকাল রাখব এটি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও যদি ফিদিয়া দিয়ে দেয় তাহলে এটি অতিরিক্ত নেকী বা ঐচ্ছিক নেকী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন, সেই পুণ্য কষ্ট করে করা হোক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নফল হিসেবে করা হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এই আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলেন, তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য সকল অর্থে উত্তম। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ মাসেই আমরা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের জন্য হেদায়েত লাভের কারণ আর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি ও নিদর্শনে সমৃদ্ধ।

অতএব রমজান মাসের সাথে কুরআনের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ মাসেই রোযা রাখার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনে প্রণিধান করা, এর আদেশ-নিষেধ খুঁজে বের করে তার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধ মেনে আমরা রমজানের রোযা থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের অর্থের গভীরে পৌঁছতে পারে না তাই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও অনুবাদ পাঠের পাশাপাশি, যা সে নিজেই পড়তে পারে, জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে যেখানে যেখানে দরসের ব্যবস্থা আছে, তা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া এম.টি.এ.-তে নিয়মিত দরসের ব্যবস্থা আছে, তা থেকেও লাভবান হওয়া আবশ্যক।

এম.টি.এ.-তে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর দরস সম্প্রচারিত হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এরও নির্দেশ এটিই যে, এ মাসে অধিক হারে কুরআন করিম তিলাওয়াত কর। বছরের অন্য সময়েও এক আহমদীর কুরআন পাঠের দিকে অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত কিন্তু রমজানে বিশেষভাবে এর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যথায় কেবল রোযা রাখা অর্থহীন। বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হবার কথা উল্লেখ করেছেন। আর মহানবী (সা.) বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব ও গভীর মর্ম আর তফসীর এবং অর্থের নতুন নতুন দিক সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি এর উপর আমল করা এবং কুরআন করীমকে সম্মান করা এবং এর তিলাওয়াত ও এতে প্রণিধান করার দিকেও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আর বলেছেন, এর তিলাওয়াত এবং এর ওপর আমলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এছাড়া আমাদের নিজেদের অবস্থার মাঝে কী ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে হবে তাও তিনি অবহিত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, বাহ্যিক জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক জ্ঞান আর কুরআনের জ্ঞান- এই উভয়ের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক ও গতানুগতিক জ্ঞান অর্জন তাকওয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ নয়। আরবী ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি পড়ার জন্য তাকওয়া আবশ্যক নয়। যেমন আরবী ব্যকরণ পড়ে নিলাম, পদার্থবিদ্যা পড়লাম, জ্যোতির্বিদ্যা পড়লাম, বা চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার জন্য তাকওয়া থাকা আবশ্যক নয় অথবা তার নামায রোযায় নিয়মানুবর্তী হওয়া আবশ্যক নয়। এ কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন বোঝার জন্য নিয়মিত নামায, রোযা ও ইবাদত করা আবশ্যক। তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করাও আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, ঐ ক্ষেত্রে নিয়মিত নামায পড়া বা রোযা রাখা আবশ্যক নয়, ঐশী আদেশ ও নিষেধকে সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা তথা আল্লাহ্ তা'লা যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং যেগুলো করতে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন তা সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক নয়। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য এটি আবশ্যক নয় কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য এগুলো আবশ্যক। সার কথা হলো জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য (তাকওয়া) আবশ্যক নয় কিন্তু কুরআন পাঠ বা কুরআনের করীমের জ্ঞান লাভের জন্য আল্লাহ্র সকল আদেশ এবং নিষেধকে মানুষের জন্য সামনে রাখা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, নিজেদের সকল কথা এবং কর্ম আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর অধীনস্ত রাখা উচিত। বরং অনেকসময় দেখা গেছে, জাগতিক জ্ঞানের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং জাগতিক জ্ঞান অন্বেষী নাস্তিকতার শিকার হয়ে সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অধুনাকালে পৃথিবীর সামনে একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যদিও ইউরোপ আমেরিকা জাগতিক জ্ঞানে অনেক উন্নতি করছে আর নিত্যদিন নিত্য নতুন আবিষ্কারাদি করে থাকে কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাস্কর। আর আজকে তো আমরা দেখছি যে, স্বাধীনতার নামে নৈতিকতার ক্ষেত্রে তারা সে যুগের চেয়েও অনেক বেশি অধঃপতনের শিকার হচ্ছে। তিনি বলেন, লন্ডনের পার্ক আর প্যারিসের হোটেলের বৃত্তান্ত যা ছেপেছে তা উল্লেখ করতেও আমাদের রুচিতে বাধে। কিন্তু স্বর্গীয় জ্ঞান এবং কুরআনী নিগূঢ় তত্ত্ব জানার জন্য তাকওয়া হলো প্রথম শর্ত। এ ক্ষেত্রে **'তওবাতুন নসূ'** অর্থাৎ খাঁটি তওবা করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ সত্যিকার

তওবার প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পুরো বিনয় ও নম্রতার সাথে খোদার নির্দেশাবলী শিরোধার্য না করবে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে আর তাঁর প্রতাপ ও তাঁর ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে বিনয়ের সাথে প্রত্যাবর্তন না করবে, কুরআনের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হতে পারে না। আর আত্মার এসব গুণাবলী এবং বৃত্তির প্রতিপালন কুরআন থেকে সে পেতে পারে না যা লাভের ফলে আত্মায় এক প্রকার আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ হয়।

অতএব কুরআনী জ্ঞান লাভ করার জন্য তাকওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আরো বলেন, কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'লার গ্রন্থ, এর জ্ঞানের চাবিকাঠি আল্লাহ্‌র হাতে। অতএব তাকওয়া এর জন্য সিড়ি স্বরূপ। তাকওয়ার সিড়ি ব্যবহার করলেই কুরআনী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ হবে। তাই এটি কিভাবে হতে পারে যে, বেঈমান, দুস্কৃতকারী, নোংরা প্রকৃতির মানুষ, জাগতিক কামনা বাসনার পূজারী তা থেকে লাভবান হবে? তাই এক মুসলমান মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে, তা সে আরবী ব্যাকরণ, রূপক ও অলংকার শাস্ত্রের যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন, জগতের লোকদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় শায়খুল কুল সেজেও যদি বসে অর্থাৎ সব জ্ঞান রাখে, আরবী ব্যাকরণও জানে, আরবীর জ্ঞানও খুব রাখে, কুরআনের খুব ভালো অর্থও করতে পারে, কিন্তু যদি আত্মশুদ্ধি না করে তাহলে কুরআনের জ্ঞান থেকে তাকে অংশ দেয়া হয় না। তিনি বলেন, আমি দেখছি যে, এখন পৃথিবীর মনোযোগ অনেক বেশি জাগতিক জ্ঞানের প্রতি নিবদ্ধ। পাশ্চাত্যের ভাবধারা তাদের নতুন আবিষ্কারাদি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বকে হতচকিত করে রেখেছে। মুসলমানরাও যদি নিজেদের মঙ্গল ও সাফল্যের পথ নিয়ে চিন্তা করে তাহলে দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্যবাসীদের নিজেদের ইমাম বানানোর কথাই চিন্তা করেছে। তারা জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আর বৈষয়িক এই উন্নতি অর্থাৎ জাগতিক উন্নতিকেই সবকিছু ভেবে বসেছে। তিনি বলেন, এ তো নব্য আলোকিত চিন্তাধারার লোকদের অবস্থা, কিন্তু যারা পুরোনো ফ্যাশনের মুসলমান আখ্যায়িত হয় আর নিজেদেরকে ইসলাম ধর্মের সুরক্ষাকারী মনে করে তাদের সারা জীবনের প্রাপ্তির সার ও নির্যাস কেবল এতটুকু যে, তারা আরবী ব্যাকরণের বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত এবং যোয়াল্লিন শব্দের উচ্চারণ নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। এই বিষয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত যে, গ্রামার কী, সারাফ কী এবং নাহাব কাকে বলে, সঠিক উচ্চারণ কীভাবে করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফের প্রতি আদৌ মনোযোগ নেই। আর হবেই বা কিভাবে, কেননা আত্মশুদ্ধির প্রতি যে তারা মনোযোগী নয়। সুতরাং তিনি বলেন, আহমদীদের এ কথা সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, কেবল জাগতিকতার পেছনে ছুটবে না বরং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা কর।

পুনরায় একবার তাঁকে এক সাহেব প্রশ্ন করে যে, কুরআন শরীফ কিভাবে পড়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআন গভীর অভিনিবেশ, মনোযোগ ও মনোনিবেশসহকারে পাঠ করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে রয়েছে , **رُبَّ قَارٍ يَلْعَنُهُ الْقُرْاٰن** অর্থাৎ কুরআনের এমন অনেক পাঠকারী দেখা যায় যাদেরকে কুরআন অভিসম্পাত করে। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কিন্তু তদনুযায়ী কর্ম করে না, তাকে কুরআন অভিশাপ দেয়। কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন কুরআনের রহমতের আয়াত আসে তখন যেন খোদা তা'লার রহমত যাচনা করা হয় আর যেখানে কুরআনে কোন জাতির শাস্তির বিষয় উল্লেখ করা হয় সেখানে খোদা তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা লাভের জন্য তাঁর আশ্রয় প্রার্থণা করা অর্থাৎ তওবা ও এস্তেগফার করা উচিত এবং গভীর অভিনিবেশসহকারে কুরআন পাঠ করা উচিত অর্থাৎ আর তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

অতএব এই হলো কুরআন পাঠের সঠিক পদ্ধতি। এ দিনগুলোতে যেহেতু কুরআন পাঠের দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে, তাই আমাদের এরূপ অভিনিবেশসহকারে ও চিন্তাভাবনার সাথে কুরআন পাঠ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন,

তোমরা সাবধান থাক এবং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা এবং কুরআনের আদেশাবলীর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও নিবে না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশত আদেশাবলীর একটি ছোট আদেশকেও অবজ্ঞা করে, সে নিজ হাতে নিজের মুক্তির পথ রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মুক্তির পথ পবিত্র কুরআনই উন্মোচন করেছে এবং বাকি সবকিছুই এর ছায়াবিশেষ। তাই তোমরা কুরআন অভিনিবেশসহকারে পাঠ কর এবং কুরআনের সাথে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হও, এমন প্রেমবন্ধন যা তোমরা অন্য কারো সাথে স্থাপন করনি। কেননা খোদা তা'লা যেভাবে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, **"আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন"** তথা সকল প্রকারের কল্যাণ কুরআনের মাঝেই নিহিত-এ কথাই ধ্রুবসত্য। তাদের জন্য পরিতাপ যারা অন্য কিছুকে কুরআনে উপর প্রাধাণ্য দেয়। তোমাদের সকল উন্নতি ও মুক্তির উৎস্য হল কুরআনে। তোমাদের ধর্মীয় এমন কোন প্রয়োজন নেই যা কুরআন পূর্ণ করে না। কুরআন কেয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সত্যায়নকারী বা ঈমানকে মিথ্য প্রমাণকারী হবে কুরআন। তাই কুরআন বৈ আকাশের নিচে অন্য কোন (ঐশী) গ্রন্থ নেই যা কুরআনের মাধ্যম ব্যতিরেকে তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে। কুরআনের মাধ্যমে যদি পথচল তাহলে কুরআন তোমাদের হেদায়েত দেবে। খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআনের ন্যায় এক মহান কিতাব তোমাদেরকে দান করেছেন। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, এই কিতাব যা তোমাদের প্রতি পাঠ করা হয়েছে, তা যদি খ্রিষ্টানদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তাহলে তারা ধ্বংস হতো না। এই নেয়ামত ও হেদায়েত, যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, ইহুদীদেরকে তওরাতের বদলে যদি দেওয়া হতো তাহলে তাদের কতক দল কেয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। তাই তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে সেই নেয়ামতের সঠিক মূল্যায়ন কর। এটি অতি প্রিয় এক নেয়ামত, অনেক বড় এক সম্পদ। যদি কুরআন না আসতো তাহলে পুরো জগত ছিল এক নোংরা মাংসপিণ্ডের ন্যায়। পবিত্র কুরআন হলো সেই কিতাব যার বিপরীতে অন্য সকল হেদায়েত তুচ্ছ।

অতএব কুরআন পাঠ করা, এটিকে বুঝা, এর পথনির্দেশনা তদনুযায়ী আমল করার দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। রমজানে অনেকের এ দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েই থাকে। এটিকে জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে রমজান মাসে কুরআন পাঠের দিকে মু'মিনদের যে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এর কারণ, এই সংগ্রাম-সাধনার মাস অতিবাহিত করতে গিয়ে যদি আমরা কুরআন পাঠের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেই তাহলে সাধারণ দিনগুলোতেও এ দিকে মনোযোগী হবার অভ্যাস গড়ে উঠবে। অন্যথায় রমজান মাসে আল্লাহ্ তা'লার কুরআনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের যে উদ্দেশ্য, তা-ই ব্যহত হয়। মু'মিন সে, যে অবিচলতার সাথে পুণ্যের অন্বেষণ করে এবং তা জারী রাখে। অতএব এই মহান গ্রন্থ মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এটিকে আমাদের হেদায়েতের কারণ বানানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা আবশ্যক।

এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, নিয়মিত রোযা রাখতে হবে। আর যারা অসুস্থ বা সফরে থাকবে তাদের ছুটে যাওয়া রোযাগুলো পরবর্তীতে পূর্ণ করতে হবে। এটি এক আবশ্যকীয় বিষয়। কেবল ফিদিয়া দিলেই তোমাদের মুক্তি মিলবে না। সফর এবং অসুস্থাবস্থায় রোযা না রাখার ছাড় দিয়ে আল্লাহ তা'লা তোমাদের প্রতি এক অনুগ্রহ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'লা নিজ বান্দাদের ওপর কষ্ট চাপান না।

এরপর তিনি বলেন, রোযার দিনগুলো বিশেষভাবে আল্লাহ তা'লার মহিমা কীর্তন ও যিকরে এলাহী এবং ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত কর। আর এ বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে, আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য হেদায়েতের এমন সুমহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যা পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হেদায়েত। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই সম্ভব যদি আমরা তাকে কর্মে রূপায়ন করি। এরপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, আমার বান্দা, আমার অন্বেষী, আমার সন্ধানে যারা বিশেষভাবে প্রশ্ন করে এবং রমজান মাসে এই অন্বেষণে আরো এগিয়ে যায়; (তাদের উত্তর হলো) আমি নিকটে আছি, আমি তাদের ডাক শুনছি। বিশুদ্ধচিত্তে আমার কাছে যাচনা করলে আমি প্রার্থনা গ্রহণও করি। কিন্তু আল্লাহ তা'লা বলেন, দোয়া কবুল করানোর জন্য আবশ্যক হলো, প্রার্থনাকারীও যেন আমার কথা মান্য করে, আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে, আমার প্রতি ঈমানকে যেন সুদৃঢ় করে। এই যে অভিযোগ, আমরা তো দোয়া করি, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করেন নি, কতিপয় মানুষের পক্ষ থেকে কিছুদিন পরই এই অভিযোগ আরম্ভ হয়ে যায়। আমরা যদি আল্লাহ তা'লার নির্দেশনা না মানি, তাতে আমল না করি, আল্লাহ তা'লার কাছে তার ভালোবাসা যাচনা না করি, তার প্রকৃত বান্দা না হই, শুধু বিপদের সময় আসি বা কোন সমস্যার সময়ই তাঁকে ডাকি এবং এরপর ভুলে যাই, তাহলে এই অভিযোগ করার কী অধিকার আছে যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি? সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদেরকে শুধরাতে হবে। হ্যাঁ নিজেদের সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করার পাশাপাশি আল্লাহ তা'লার কৃপা আকর্ষণের জন্য দোয়ার প্রয়োজন হয়, তাই দোয়াও করতে হবে। এরপর আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রশান্তি ও স্বস্তির উপকরণও সৃষ্টি করবেন। তিনি দোয়া কীভাবে গ্রহণ করেন? যদি হৃদয় প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করে তাহলে এটিও দোয়া গৃহীত হওয়া। অধিকন্তু আপন নিষ্ঠাবান বান্দা এবং নিজ প্রেমিকদের দোয়া কবুল করার ন্যায় আমাদের দোয়াও আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করবেন। অতএব, রমজান মাসে প্রথম প্রচেষ্টা যদি আমাদের পক্ষ থেকে হয় তাহলে মু'মিনদের স্বীয় নৈকট্য দান এবং দোয়া গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'লা করে দেন। সুতরাং আমাদের বিশেষ চেষ্টা-সাধনা করা প্রয়োজন, অন্যথায় আল্লাহ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আমাদের কোন অধিকার নেই যে, তিনি দোয়া গ্রহণ করেন না। দোয়ার পদ্ধতি এবং নিজের অবস্থাকে দোয়া গৃহীত হবার পর্যায়ে উপনীত করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন-

তিনি বলেন, একথা সত্য, যে ব্যক্তি আমল করে না সে দোয়া করে না বরং খোদা তা'লার পরীক্ষা নেয়। তাই, দোয়া করার পূর্বে নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করা অবধারিত আর এটিই দোয়ার মর্ম বা অর্থ।

এরপর তিনি বলেন, এ কথা মনে করো না যে, আমরাও প্রতিদিন দোয়া করি এবং সব নামায যা আমরা পড়ি সেগুলো তো দোয়াই। নামায অবশ্যই দোয়া কিন্তু সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিও সৃষ্টি হওয়া উচিত, দোয়ার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটিও অর্জিত হওয়া

উচিত। তিনি বলেন, কেননা সেই দোয়া, যা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর এবং অনুগ্রহের ফলে মন থেকে উদ্ভূত হয়, এর অবস্থা ও প্রকৃতিই ভিন্ন হয়ে থাকে। সেটি বিলোপকারী বিষয়। এটা ভস্মিভূতকারী অগ্নি, রহমতকে আকর্ষণকারী এক চুম্বকীয় আকর্ষণ। এটা মৃত্যু, কিন্তু অবশেষে জীবন দান করে। এটা এক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকা হয়ে যায় অর্থাৎ তা সমুদ্রের তুফান কিন্তু সেই তুফান নৌকা হয়ে যায়, রক্ষাকবচ হয়ে যায়। তিনি বলেন, সকল বিশৃঙ্খল অবস্থা সুশৃঙ্খল হয়ে যায়। সব বিষ এক পর্যায়ে এর দ্বারা প্রতিষেধক হয়ে যায়। অতএব, প্রকৃত দোয়া এভাবে নিজের কার্যকারিতা প্রকাশ করে।

তিনি বলেন, সৌভাগ্যবান সেসব বন্দি যারা দোয়া করে ক্লান্ত হয় না, কেননা একদিন তারা মুক্তি পাবে। কল্যাণমণ্ডিত সেসব অন্ধ যারা দোয়ার ক্ষেত্রে আলস্য দেখায় না, কেননা একদিন তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কল্যাণমণ্ডিত তারা যারা কবরে পতিত অবস্থায় দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য চায়, কেননা একদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ তারা যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। তোমরা কল্যাণমণ্ডিত, যদি তোমরা দোয়ার ব্যাপারে কখনো ক্লান্তি প্রকাশ না কর আর তোমাদের আত্মা দোয়ার জন্য বিগলিত হয় ও তোমাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন করে, তোমাদের বক্ষে এক প্রকারের আগুন লাগিয়ে দেয় এবং নির্জনতার স্বাদ উপভোগের জন্য তোমাদেরকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং জন-মানবশূন্য জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং তোমাদেরকে ব্যাকুল ও পাগলপারা এবং আত্মবিস্মৃত করে তোলে কেননা অবশেষে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হবে। সেই খোদা যার প্রতি আমরা আহ্বান করছি তিনি পরম কৃপালু ও দয়ালু, লজ্জাশীল, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও অসহায়দের প্রতি দয়ার্দ্র। অতএব তোমরাও বিশ্বস্ত হয়ে যাও। পুরো আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে দোয়া কর। ফলে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। এ পৃথিবীর হট্টগোল থেকে পৃথক হয়ে যাও, নিজের পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাধারাকে ধর্মের নাম দিও না।

তিনি বলেন, দোয়াকারীদের খোদা নিদর্শন দেখাবেন এবং যাচনাকারীদেরকে এক অলৌকিক নেয়ামত দান করা হবে। দোয়া খোদার পক্ষ থেকে আসে আর খোদার দিকেই ফিরে যায়। দোয়ার ফলে খোদা এতটা নিকটে এসে যান যেমনটি তোমাদের প্রাণ তোমাদের কাছে আছে। দোয়ার প্রথম পুরস্কারস্বরূপ মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়।

তিনি বলেন, মোটকথা দোয়া সেই মহৌষধ যা এক মুষ্ঠি ধুলোকে পরশমণি বানিয়ে দেয় এবং এটি এক প্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ নোংরামিকে বিধৌত করে। এই দোয়ার মাধ্যমেই আত্মা বিগলিত হয় এবং পানির মত প্রবাহিত হয়ে আল্লাহর আস্তানায় পতিত হয়। এটি খোদার সমীপে দণ্ডায়মান হয় এবং রুকু ও সিজদা করে। এরই প্রতিচ্ছবি সেই নামায যা ইসলাম শিখিয়েছে। রূহের দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হলো, তা খোদার সন্তুষ্টির জন্য সকল সমস্যা সহ্য করে এবং নির্দেশ মানার বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ করে। এর রুকু করা বা ঝুঁকার অর্থ হলো, তা সকল ভালোবাসা এবং সম্পর্ককে ছিন্ন করে খোদার পানে বিনত হয় এবং খোদার হয়ে যায়। আর আত্মার সিজদা করা হলো, তা খোদার আস্তানায় পতিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেয়, নিজ সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় অর্থাৎ আপন অস্তিত্বের ছাপকে মিটিয়ে দেয়। এটিই সত্যিকারের নামায যা খোদার সাথে মিলিত করে আর ইসলামী শরীয়ত এর চিত্র প্রাত্যহিক নামাযে অঙ্কন করে দেখিয়েছে যেন সেই দৈহিক নামায আধ্যাত্মিক নামাযে পর্যবসিত হয় বা আধ্যাত্মিক নামাযে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। অতএব, এটি হলো সেই অবস্থা যা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে যেন আমরা দোয়া গৃহীত হবার

দৃশ্য অবলোকন করতে পারি। রমজানের রোযার পাশাপাশি ইবাদতের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্মও যেন আমরা বুঝি আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্যও যেন আমরা দেখি। যদি দোয়া কবুলিয়তে কোথাও ঘাটতি থাকে তাহলে মূলত আমাদের মাঝেই ত্রুটি রয়েছে। খোদা তা'লার কথা কখনো ভুল হতে পারে না। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে আমাদের দোয়া করা উচিত। আল্লাহ তা'লা যিনি প্রথম থেকেই নিজ বান্দাদের অতি নিকটে রয়েছেন, এ দিনগুলোতে তিনি আরো নিকটে চলে এসেছেন। নিজেদের ফরজ ইবাদতসমূহ এবং নিজেদের নফল ইবাদতসমূহে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে ঝুঁকা উচিত। মহানবী (সা.) আমাদেরকে বলেছেন, এই মাসের প্রথম দশদিন রহমত, মধ্যবর্তী দশদিন মাগফেরাতের কারণ এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানকারী। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাঁর প্রকৃত বান্দা বানিয়ে স্বীয় রহমত ও মাগফেরাতের চাদরে আবৃত করে নিন এবং এই মাস হতে আমরা যেন কল্যাণ লাভকারী হই।

এদিনগুলোতে বিশেষভাবে জামা'তের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা যেন আহমদীয়তের শত্রুদের সৃষ্ট অনিষ্টে তাদেরই ক্লিষ্ট করেন এবং যেখানে যেখানে জামা'তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে আল্লাহ তা'লা যেন সেখানে তাদের ষড়যন্ত্র এবং তাদের পরিকল্পনা তাদেরই মুখে ছুঁড়ে মারেন। (দোয়া করুন) যুগ ইমামকে যেন তারা গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন, খুব দ্রুত এটি অনেক বড় ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা বিশ্ববাসীকে সুমতি দিন, এরা যেন খোদা তা'লাকে চিনতে পারে আর এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।

নামাযের পর আমি দু'ব্যক্তির গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। তাদের মৃত্যুর ঘটনা দুই মাস পূর্বের কিন্তু তথ্য এখন আমার সামনে এসেছে। প্রথম নাম হলো ইসলামাবাদের মরহুম ইরশাদুল্লাহ্ ভাট্টি সাহেবের পুত্র ডাক্তার তাহের আজিজ আহমদ সাহেবের। আর দ্বিতীয় হলো আমেরিকার মরহুম ডাক্তার খাঁজা নাজির আহমদ সাহেবের পুত্র ডাক্তার ইফতেখার আহমদ সাহেবের জানাযা। এই দুইজন 'ফতে জাঙ্গ' এর নিকটবর্তী নিজেদের জমির বিষয়াদি দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে ডাক্তার ইফতেখার আহমদ সাহেবের এক কর্মচারী ১৩ মার্চ অপহরণ করার পর উভয়কে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সেখানে হত্যাকারীদের এই চিন্তা হয় না যে, আহমদীদের হত্যা করলে আমরা ধৃত হব, কেননা আহমদীদেরকে হত্যা করা তাদের দৃষ্টিতে পুণ্যও আর মৌলভীদের আশির্বাদও রয়েছে যে, তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, বরং পুরো চেষ্টা করবে। এই প্রেক্ষিতে কোন না কোনভাবে আহমদীয়াতের বিষয়টিও এতে জড়িত। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, তাদের শাহাদত হয়েছে।

ডাক্তার তাহের আজীজ আহমদ সাহেব ১৯৬৭ সনের ২৭ নভেম্বর মিঠা টওয়ানায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় গুরুদাসপুরের লোধী নাঙ্গাল নিবাসী তার বড় দাদা হযরত মৌলভী নূর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে। হযরত মৌলভী নূর আহমদ সাহেব (রা.) মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সেই কুফরী ফতয়োয় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন যা সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে প্রস্তুত করেছিল আর এ বিষয়ে তিনি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে পত্র লিখেছিলেন, যা আলহাকাম পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ১০ অক্টোবর ১৮৯৭ সনে প্রকাশ করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মৌলভী নূর আহমদ সাহেবের পিতা লোধী নাঙ্গাল নিবাসী মৌলভী আল্লাদাত্তা ভাট্টি সাহেবকে নিজের সন্তান মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব এবং মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এর শিক্ষার জন্য কাদিয়ানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যার উল্লেখ তারিখে আহমদীয়াতের ১ম খণ্ডে রয়েছে। মরহুম মেট্রিকের পর

ইসলামাদ হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ থেকে ডিএইচএমএস পাশ করেন, এরপর চাট্টা বাখতাবর ইসলামাবাদে প্র্যাক্টিস শুরু করেন। অত্যন্ত সর্বজনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, বিনয়ী, সহানুভূতিশীল ও ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ডাক্তার সাহেবের ঘর নামায সেন্টার হিসেবেও ব্যবহার হতে থাকে। খিলাফতের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ। তার মৃত্যুতে শত শত অআহমদী পুরুষ ও মহিলা শোক প্রকাশ করে আর তার মৃত্যুকে জাতীয় ক্ষতি বলেও উল্লেখ করেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মরহুম তার স্ত্রী ছাড়াও দুজন কন্যা এবং একজন পুত্র রেখে গেছেন। তার পুত্র খালেদ সাহেব এখানেই অর্থাৎ লন্ডনে থাকেন, তিনি রানা খালেদ সাহেবের জামাতা। মরহুমের বড় ভাই ফুযায়েল আইয়াজ সাহেব যিনি ওয়াকফে জিন্দেগী মুরব্বী, প্রথমে এম.টি.এ.-তে সেবা করছিলেন, বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে আছেন।

দ্বিতীয় মরহুম হলেন ডাক্তার ইফতেখার আহমদ সাহেব। তার সম্পর্ক গুজরানওয়ালা জেলার ত্রিগড়ির সাথে। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মুহাম্মদ জামাল সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াত আসে দ্বিতীয় খেলাফতের যুগে তার দাদা খাজা জালালুদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে। তার পিতা খাজা নজীর আহমদ সাহেব রাবওয়ার তালিমুল ইসলাম কলেজে ক্যামেস্ট্রি পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম ডাক্তার সাহেব লাহোরের কিং এ্যাডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করার পর প্রায় তিন বছর নাইজেরিয়ার কানুস্থ আহমদীয়া ক্লিনিকে সেবা দানের সুযোগ পেয়েছেন। তিন বছর পর আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এমডি করেন, তারপর প্রায় ১৫ বছর পাকিস্তানে অবস্থানের পর তিন বছর পূর্বে পুনরায় তিনি আমেরিকায় স্থানান্তরিত হন। সেখানে (অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়াতে) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেখানেই কাজ শুরু করে দেন। মাঝে সন্তানদের কারণে পাকিস্তানে চলে আসেন। মরহুম গরীবদের লালনকারী ও মানব সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন আর বিভিন্ন আর্থিক তাহরীকে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন এবং এক নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে মরহুম স্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন। আল্লাহ তা'লা উভয় মরহুমের প্রতি অনুগ্রহ এবং ক্ষমার আচরণ করুন আর তাদের সন্তানদেরকেও জামা'ত এবং খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।